কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ চিঠি ও মানপত্রের সংকলন

১। প্রাচীনতম বাংলা পত্র

নরনারায়ণে [মল্লদেব]র পত্র

লেখনং কার্য্যঞ্চ এথা আমার কুশল তোমার কুশল নিরন্তরে বাঞ্ছা করি। অখন তোমার আমার সন্তোষ সম্পাদক পত্রাপত্রি গতায়াত হইলে উভয়ানুকূল প্রীতির বীজ অঙ্কুরিত হইতে রহে তোমার আমার কর্ত্তব্যে সে বর্দ্ধিতাক পাই পুষ্পিত ফলিত হইবেক আমরা সেই উদ্যোগত আছি তোমারো এ-গোট কর্ত্তব্য উচিত হয় না কর তাক আপনে জান। অধিক কি লেখিম সতানন্দ কর্ম্মী রামেশ্বর শর্ম্মা কালকেতু ও ধুমাসর্দ্দার উদ্দণ্ড চাউনিয়া শ্যামরাই ইমরাক পাঠাইতেছি তামরার মুখে সকল সমাচার বুঝিয়া চিতাপ বিদায় দিবা।

অপর উকীল সঙ্গে ঘুড়ি ২ ধনু ১ চেঙ্গা মৎস্য ১ জোর বালিচ ১ জকাই ১ সারি ৫ খান এই সকল দিয়া গইছে আরু সমাচার বুজি কহি পাঠাইবেক তোমার অর্থে সন্দেশ গোমচেং ১ ছিট ৫ ঘাগরি ১০ কৃষ্ণচামর ২০ শুক্লচামর ১০।

লিপিকাল। ১৫৫৫

২। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পত্র

[কালীপ্রসন্ন ঘোষকে লেখা]

সুহৃদ্বরেষু—

আপনার পত্রগুলির যে উত্তর দিতে পারি না, তাহার অন্যান্য কারণের মধ্যে একটি কারণ এই যে, তাহার উত্তর অদেয়। আপনি যাহা লেখেন তাহা এত মধুর যে, উত্তর যাহাই দিই না কেন তাহা কর্কশ হইবে। আপনার পত্রের উত্তর দেওয়া, আর অমৃত পান করিয়া ধন্বন্তরিকে মূল্য দেওয়া সমান বলিয়া বোধ হয়। আপনার পত্রের উত্তর না দেওয়াই ভাল—কোকিলকে Thanks দিয়া কি হইবে ? আপনার নববর্ষ প্রভৃতি দিবসের সম্ভাষণ সম্বন্ধে এই কথা বিশেষ খাটে। আপনি নিজে পীড়িত ; চক্ষের যন্ত্রণায় লিখিতে অসমর্থ, তথাপি আমাদের মঙ্গল আন্তরিক কামনা করিয়া পত্র লিখিয়াছেন। আপনার তুল্য মনুষ্য অতি দুর্লভ। আপনাকে কায়মনোবাক্যে আশীর্বাদ করিতেছি, আপনি অচিরাৎ সুস্থ হইয়া স্বদেশের উন্নতি সাধন করিতে থাকুন।

স্যার আশলি ইডেনের স্বদেশ গমন উপলক্ষে কলিকাতায় হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। কেহ বলে, গোবর জল ছড়াইয়া দাও। কেহ বলে, "অরে নিদারুণ প্রাণ ! কোন পথে·····যান, আগে যা রে পথ দেখাইয়া" ইত্যাদি ইত্যাদি। আমাদের লাভের মধ্যে দুই একটা সমারোহ দেখিতে যাইব।

আমার দৌহিত্রটি এ পর্যন্ত আরোগ্য লাভ করিতে পারে নাই, তবে পূর্বাপেক্ষা ভাল আছে। আর ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, যম, কুবের প্রভৃতি দিক্‌পালগণ পূর্বমত দিক্‌পালন করিতেছেন—চন্দ্রের মধ্যে মধ্যে পূর্ণোদয় হয়, মধ্যে মধ্যে অমাবস্যা। এখন কালী প্রসন্ন হইলেই আনন্দমঠ বজায় হয়। ইতি তাং ৪ বৈশাখ [১২৮৯ সাল]

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিঠি

[ইন্দিরা দেবীকে লিখিত পত্র। ৭ অক্টোবর ১৮৯৪]

..... তোকে আমি যে-সব চিঠি লিখেছি তাতে আমার মনের সমস্ত বিচিত্র ভাব যে রকম ব্যক্ত হয়েছে এমন আমার আর কোনো লেখায় হয় নি।.....তোকে আমি যখন লিখি তখন আমার এ কথা কখনো মনে উদয় হয় না যে, তুই আমার কোনো কথা বুঝবি নে, কিম্বা ভুল বুঝবি, কিম্বা বিশ্বাস করবি নে, কিম্বা যেগুলো আমার পক্ষে গভীরতম সত্য কথা সেগুলোকে তুই কেবলমাত্র সুরচিত কাব্যকথা বলে মনে করবি। সেই জন্যে আমি যেমনটি মনে ভাবি ঠিক সেই রকমটি অনায়াসে বলে যেতে পারি। যখন মনে জানি পাঠকরা আমাকে ভালো করে জানে না, আমার অনেক কথাই তারা ঠিকটি বুঝবে না এবং নম্রভাবে বোঝবার চেষ্টাও করবে না এবং যেটুকু তাদের নিজের মানসিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলবে না সেটুকু আমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে গ্রহণ করবে না—তখন মনের ভাবগুলি তেমন সহজে ভাষায় প্রবাহিত হতে চায় না এবং যতটুকু প্রকাশ হয় তার মধ্যে অনেকখানি ছদ্মবেশ থেকে যায়। এর থেকেই বেশ বুঝতে পারি আমাদের সব চেয়ে যা শ্রেষ্ঠ প্রকাশ সে আমরা কাউকে নিজের ইচ্ছা-অনুসারে দিতে পারি নে। আমাদের ভিতরে সবচেয়ে যা গভীরতম উচ্চতম অন্তরতম সে আমাদের আয়ত্তের অতীত ; তা আমাদের দান-বিক্রয়ের ক্ষমতা নেই .....আমরা দৈবক্রমে প্রকাশ হই ; আমরা ইচ্ছা করলে, চেষ্টা করলেও প্রকাশ হতে পারিনে—চব্বিশ ঘন্টা যাদের সঙ্গে থাকি তাদের কাছেও আপনাকে ব্যক্ত করা আমাদের সাধ্যের অতীত। .....তোর এমন একটি অকৃত্রিম স্বভাব আছে, এমন একটি সহজ সত্যপ্রিয়তা আছে যে, সত্য আপনি তোর কাছে অতি সহজেই প্রকাশ হয়। সে তোর নিজের গুণে। যদি কোনো লেখকের সব চেয়ে ভালো লেখা তার চিঠিতেই দেখা দেয় তা হলে এই বুঝতে হবে যে, যাকে চিঠি লেখা হচ্ছে তারও একটি চিঠি লেখাবার ক্ষমতা আছে। আমি তো আরও অনেক লোককে চিঠি লিখেছি, কিন্তু কেউ আমার সমস্ত লেখাটা আকর্ষণ করে নিতে পারেনি।.....তোর অকৃত্রিম স্বভাবের মধ্যে একটি সরল স্বচ্ছতা আছে, সত্যের প্রতিবিম্ব তোর ভিতরে বেশ অব্যাহতভাবে প্রতিফলিত হয়।..... —রবীন্দ্রনাথ

৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিয়ের চিঠি—তাঁর নিজের লেখা বন্ধু প্রিয়নাথ সেনকে।

প্রিয়বাবু,

আগামী রবিবার ২৪শে অগ্রহায়ণ তারিখে শুভদিনে শুভলগ্নে আমার পরমাত্মীয় শ্রীমান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শুভবিবাহ হইবেক। আপনি তদুপলক্ষে বিকালে উক্ত দিবসে ৬নং যোড়াসাঁকোস্থ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভবনে উপস্থিত থাকিয়া বিবাহাদি সন্দর্শন করিয়া আমাকে এবং আত্মীয়বর্গকে বাধিত করিবেন। ইতি—

অনুগত
শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৫। কাজী নজরুল ইসলাম কর্তৃক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লেখা চিঠি

শ্রীচরণারবিন্দেষু,

গুরুদেব! বহুদিন শ্রীচরণ দর্শন করিনি। আমার ওপর হয়ত প্রসন্ন কাব্য-লক্ষ্মী হিজ মাস্টার্স-ভয়েসের কুকুরের ভয়ে আমায় ত্যাগ করেছেন বহু দিন। কাজেই সাহিত্যের আসর থেকে আমি প্রায় স্বেচ্ছানির্বাসন নিয়েছি। আপনার তপস্যায় আমি কখনো উৎপাত করেছি বলে মনে পড়ে না, তাই অবকাশ সত্ত্বেও আমি আপনার দূরে দূরেই থেকেছি। তবু জানি আমার শ্রদ্ধার শতদল আপনার চরণস্পর্শ থেকে বঞ্চিত হয়নি।

আমার কয়েকজন অন্তরঙ্গ সাহিত্যিক ও কবি বন্ধু "নাগরিক" পরিচালনা করছেন। গতবার পূজায় আপনার কিরণস্পর্শে "নাগরিক" আলোকিত হয়ে উঠেছিল, এবারও আমরা সেই সাহসে আপনার দ্বারস্থ হচ্ছি। আপনার যে-কোনো লেখা পেলেই ধন্য হব। ভাদ্রের শেষেই পূজা সংখ্যা "নাগরিক" প্রকাশিত হবে, তার আগেই আপনার লেখনীপ্রসাদ আমরা পাব আশা করি।

আপনার স্বাস্থ্যের কথা আর জিজ্ঞাসা করলাম না।

ইতি

প্রণত—
নজরুল ইসলাম।

৬। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক উপরিউক্ত চিঠির জবাব

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু,

অনেকদিন পরে তোমার সাড়া পেয়ে মন খুব খুশি হলো। কিছু দাবী করেছ—তোমার দাবী অস্বীকার করা আমার পক্ষে কঠিন। আমার মুস্কিল এই, পঁচাত্তর পড়তে তোমার এখনো অনেক দেরি আছে এই জন্যে আমার জীর্ণদেহের পরে তোমার দরদ নেই। কোনো মন্ত্রবলে বয়স বদল করতে পারলে তোমার শিক্ষা হোতো। কিন্তু মহাভারতের যুগ অনেক দূরে চলে গেছে এখন দেহে মনে মানব সমাজকে চলতে হয় সায়াসের সীমানা বাঁচিয়ে।

অনেকদিন থেকে আমার আয়ুর ক্ষেত্রে ক্লান্তির ছায়া ঘনিয়ে আসছিল। কিছুদিন থেকে তার উপরেও দেহমনের বিকলতা দেখা দিয়েছে।

এখন মূলধন ভেঙে দেহ যাত্রা নির্বাহ করতে হচ্ছে যা ব্যয় হচ্ছে তা আর পূরণ হবার উপায় নেই। তোমাদের বয়সে লেখা সম্বন্ধে প্রায় দাতাকর্ণ ছিলুম, ছোটবড়ো সকলকে অন্তত মুষ্টি ভিক্ষাও দিয়েছি। কলম এখন কৃপণ, স্বভাবদোষে নয়, অভাববশত। ছোটো বড়ো নানা আয়তনের কাগজের পত্রপুট নিয়ে নানা অর্থী আমার অঙ্গনে এসে ভিড় করে। প্রায় সকলকেই ফেরাতে হলো। আমার অনাবৃষ্টির কুয়োয় শেষতলায় অল্প যেটুকু জল জমেছিল সেটুকু নিঃশেষ হয়ে গেছে। আমি প্রতিজ্ঞা করেছি কৃপণের অখ্যাতি শেষ বয়সে স্বীকার করে নিয়ে রিক্ত দানপত্র হাতে বিদায় নেব। যারা ফিরে যাবে তারা দুয়ো দিয়ে যাবে কিন্তু বৈতরণীর মাঝ দরিয়ায় সে ধ্বনি কানে উঠবে না।

আজকাল দেখতে পাই ছোটো বিস্তর কাগজের অকস্মাৎ উদ্‌গম হচ্ছে—ফুল ফসলের চেয়ে তাদের কাঁটার প্রাধান্যই বেশি। আমি সেকেলে লোক, বয়সও হয়েছে। সাহিত্যে পরস্পর খোঁচাখুঁচির প্রাদুর্ভাব কেবল এই জন্যে এখানকার ক্ষণসাহিত্যের কাঁচা রাস্তায় যেখানে সেখানে পা বাড়াতে আমার ভয় লাগে। সাবধানে বাছাই করে চলবার সময় নেই, নজরও ক্ষীণ হয়েছে, এইজন্যে এই সকল গলিপথ একেবারে এড়িয়ে চলাই আমার পক্ষে নিরাপদ। তুমি তরুণ কবি এই প্রাচীন কবি তোমার কাছ থেকে আর কিছু না হোক করুণা দাবী করতে পারে। নিষ্কিঞ্চনের কাছে প্রার্থনা করে তাকে লজ্জা দিয়ো না। এই নতুন যুগে যে সব যাত্রী সাহিত্যতীর্থে যাত্রা করবে, পাথেয় তাদের নিজের ভিতর থেকেই সংগ্রহ করতে হবে।

শুনেছি বর্ধমান অঞ্চলে তোমার জন্ম। আমরা থাকি তার পাশের জিলায়—কখনো যদি ঐ সীমানা পেরিয়ে আমাদের এদিকে আসতে পারো খুশি হব। স্বচক্ষে আমার অবস্থাও দেখে যেতে পারবে। ইতি। ১৫ ভাদ্র ১৩৪২

স্নেহরত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিঠি

আবুল ফজলকে লেখা

বিনয় সম্ভাষণ,

কিছুদিন হতে দৃষ্টিক্ষীণতাবশত পড়াশুনা করতে কষ্ট হয়। ডাক্তার চোখকে বিশ্রাম দিতে বলেন।

ভাষা ব্যবহার সম্বন্ধে আপনি ঠিক কথাই বলেছেন। আচারে পার্থক্য ও মনস্তত্ত্বের বিশেষত্ব অনুবর্তন না করলে ভাষায় সার্থকতাই থাকে না। তথাপি ভাষার নমনীয়তার একটা সীমা আছে। ভাষার যেটা মূল স্বভাব তার অত্যন্ত প্রতিকূলতা করলে ভাব প্রকাশের বাহনকে অকর্মণ্য করে ফেলা হয়। প্রয়োজনের তাগিদে ভাষা বহুকাল থেকে বিস্তর নতুন কথা আমদানী করে এসেছে। বাংলা ভাষায় পারসী আরবী শব্দের সংখ্যা কম নয় কিন্তু তারা সহজেই স্থান পেয়েছে। প্রতিদিন একটা দুটো করে ইংরেজী শব্দও আমাদের ব্যবহারের মধ্যে প্রবেশ করছে। ভাষার মূল প্রকৃতির মধ্যে একটা বিধান আছে যার দ্বারা নতুন শব্দের

যাচাই হতে থাকে, গায়ের জোরে সেই বিধান না মানলে জারজ শব্দ কিছুতেই জাতে ওঠে না। ইংরেজী ভাষার দিকে তাকিয়ে দেখলে আমার কথার সত্যতা বুঝতে পারবেন। ওয়েলস আইরিশ স্কচ ভাষা ইংরেজী ভাষার ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী, ব্রিটনের ঐ সকল উপজাতিরা আপন আত্মীয় মহলে ঐ সকল উপভাষা থেকে শব্দ গ্রহণ করে স্বভাবতই ব্যবহার করে থাকেন কিন্তু যে সাধারণ ইংরেজী ভাষা তাঁদের সাহিত্যের ভাষা ঐ শব্দগুলি তার আসরে জবরদস্তি করতে পারেনা। এই জন্যেই ঐ সাধারণ ভাষা আপন নিত্য আদর্শ রক্ষা করে চলতে পেরেছে। নইলে ব্যক্তিগত খেয়াল অনুসারে নিয়ত তার বিকার ঘটত। 'খুনখারাবি' শব্দটা ভাষা সহজে মেনে নিয়েছে, আমরা তাকে যদি না মানি তবে তাকে বলব গোঁড়ামি। কিন্তু রক্ত অর্থে খুন শব্দকে ভাষা স্বীকার করেনি, কোন বিশেষ পরিবারে বা সম্প্রদায়ে ঐ অর্থই অভ্যস্ত হতে পারে তবু সাধারণ বাংলা ভাষায় ঐ অর্থ চালাতে গেলে ভাষা বিমুখ হবে। শক্তিমান মুসলমান লেখকরা বাংলা সাহিত্যে মুসলমান জীবন যাত্রার বর্ণনা যথেষ্ট পরিমাণে করেননি, এ অভাব সম্প্রদায় নির্বিশেষে সমস্ত সাহিত্যের অভাব। এই জীবন যাত্রার যথোচিত পরিচয় আমাদের পক্ষে অত্যাবশ্যক। এই পরিচয় দেবার উপলক্ষ্যে মুসলমান সমাজের নিত্য ব্যবহৃত শব্দ যদি ভাষায় স্বতই প্রবেশ লাভ করে তবে তাতে সাহিত্যের ক্ষতি হবে না বরং বলবৃদ্ধি হবে, বাংলা ভাষার অভিব্যক্তির ইতিহাসে তার দৃষ্টান্ত আছে।

আপনার চৌচির গল্পটি আমার দৃষ্টিকে ক্লিষ্ট করেও পড়েচি। আমার পক্ষে এ গল্প বিশেষ ঔৎসুক্যজনক। আধুনিক মুসলমান সমাজের সমস্যা ঐ সমাজের অন্তরের দিক থেকে জানতে হলে সাহিত্যের পথ দিয়েই জানতে হবে—এই প্রয়োজন আমি বিশেষ করেই অনুভব করি।

আপনাদের মতো লেখকদের হাত থেকে এই অভাব যথেষ্টভাবে পূর্ণ হতে থাকবে এই আশা করেই রইলুম। চাঁদের এক পৃষ্ঠে আলো পড়ে না সে আমাদের অগোচর, তেমনি দুর্দৈবক্রমে বাংলাদেশের আধখানায় সাহিত্যের আলো যদি না পড়ে তা হলে আমরা বাংলাদেশকে চিনতে পারব না, না পারলে তার সঙ্গে ব্যবহারে ভুল ঘটতে থাকবে। কিন্তু এই পরিচয় স্থাপন ব্যাপারে কোন একটা জিদ বশত ভাষার প্রতি যদি নির্মমতা করেন তা হলে উল্টো ফল ফলবে। এই উল্টো ফল ফলাবার অধ্যবসায়ে বাংলাদেশ আজ কন্টকিত। চোখ একটু সুস্থ হলে আপনার অন্য দুটি বই পড়বার চেষ্টা করব। একটু আধটু যা চেয়ে দেখতে পেরেছি তাতে বোধ হয়েছে আপনার লেখনীর অবাধ গতি আছে। ইতি ৬/৯/৪০

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮। **কাজী নজরুল ইসলামের পত্র**

(বেগম শামসুন নাহার মাহমুদকে লিখিত)

81, Pan Bagan Lane
Calcutta
4-2-29

চিরআয়ুষ্মতীসু !

ভাই নাহার ! কাল ঠাকুরগাঁ থেকে এসে তোমার চিঠি পেলাম। পেয়ে যেমন খুশি হলাম, তেমনি একটু অবাকও হলাম। খুশি হলাম তার কারণ, আমি তোমায় চিঠি দিইনি এসে, দিয়েছি বাহারকে। অসম্ভাবিতের দেখা সকলের মনেই একটু দোলা দেয় বই-কি ! অবাক হলাম, আমাদের দেশে, বিশেষ করে আমাদের সমাজের কোন কোন বিবাহিতা মেয়ে একজন অনাত্মীয়কে (আমি রক্তের সম্পর্কের কথা বলছি ভাই, রেগো না যেন এ কথাটাতে) চিঠি লিখতে সাহস করে, তা সে যত সহজ চিঠিই হোক। তাছাড়া, তুমি স্বভাবতই একটু অতিরিক্ত shy, বা timid.

সত্য বলতে কি, তোমার চিঠি পেয়ে বড্ড বেশি আনন্দিত হয়েছি।

সলিম কি ফিরেছে ? ওরা অর্থাৎ বাহার, সলিম কখন আসবে কলকাতায় ?

সাতই তারিখে চিঠি দিয়েছ এবং লিখেছ 'কালই কবিতাগুলো পাঠাব'। আজ চৌদ্দ তারিখ। আমার মনে হয় তোমার 'কাল' হয়তো কোন অনাগত দিনকে লক্ষ্য করে লিখিত হয়েছিল, যার কোন বাঁধা-ধরা তারিখ নেই।